সংকলন - ৪ । অক্টোবর ২০১৩

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা স্কুল পরিদর্শক দপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা
পি.ও.-কৃষ্ণনগর, জেলা-নদীয়া

মেমো নঃ-৪৭৯(৬৪১)/জেন/এস.ই.

তারিখঃ ০২.০৯.২০১৩

হইতেঃ জেলা স্কুল পরিদর্শক/ডি.আই. (এস.ই.) নদীয়া
প্রতিঃ সচিব/প্রশাসক/প্রধানশিক্ষক/প্রধানশিক্ষিকা/টি.আই.সি.

বিষয়ঃ বিদ্যালয় সবজি বাগান এবং পুকুর তৈরি

উপরিউক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত উদ্যোগের ক্ষেত্রে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, নদীয়ার জেলাশাসক MGNREGA প্রকল্পের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলিতে সবজি বাগান তৈরি করার এবং মাছচাষের পুকুর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উপকরণ যেমন – বীজ, চারা, শ্রমিক সমস্তই স্থানীয় প্রশাসনের মধ্য দিয়ে সরবরাহ করা হবে। সেজন্য আপনার বিদ্যালয়ে এবং মাদ্রাসায় যে কোনো আকারের ১ শতক জমি যেখানে সবজি বাগান করা যেতে পারে এবং পুকুর (যদি থাকে) যেখানে মৎসচাষ করা যেতে পারে চিহ্নিত করুন। এই উদ্যোগের যাবতীয় স্কিম স্থানীয় প্রশাসনের কাছে পাওয়া যাবে, এজন্য অনুগ্রহ করে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনিক দপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরিউক্ত কর্মকাণ্ড শুরু করার জন্য ০২/০৯/২০১৩ দিনটি ধার্য করা হয়েছে। সেজন্য এই সবজি বাগান এবং মৎসচাষের উদ্যোগকে নিবিড় ভাবে সফল করে তুলতে ০২/০৯/২০১৩ তারিখ থেকে সর্বতোভাবে তৈরি হোন। আপনার দ্রুত উত্তর খুব জরুরী।

জেলা স্কুল পরিদর্শক/ডি.আই. (এস.ই.), নদীয়া

নবদিশার পথে সাতালী গ্রাম পঞ্চায়েত

জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের এক প্রান্তে অবস্থিত সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি গ্রাম হল "মধ্য সাতালি বস্তি" যেখানে ভিন্ন জাতি ও ভাষার মানুষ একই সাথে সুন্দর পরিবেশে বসবাস করে ও একে অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

এই সুন্দর পরিবেশকে আরো সুন্দর করে গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছে এখানকার একটি স্কুল "সাতালি জুনিয়র বেসিক প্রাইমারী স্কুল"।

স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা শ্রীমতি অমিতা মণ্ডল ও সহকারী শিক্ষক শ্রী অরুণ কুমার দেবনাথ মনে করেন যে, স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চা যদি ছোটবেলা থেকে শুরু করা যায় তাহলে সেগুলি লুপ্ত হবে না এবং আরো বিশ্বাস করেন যে এই চর্চার মধ্য দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হবে যা তাদের মানসিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে। এই চিন্তাভাবনা থেকেই তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে লোকসংস্কৃতির উপর দক্ষ সুজাতা কেরকেট্টা নামে স্থানীয় একটি মেয়েকে চিহ্নিত করে সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটি দিন ঠিক করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তারা শুরু করেছেন স্থানীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে উন্নতির কাজ যা থেমে থাকেনি স্কুল ছুটির দিনগুলিতেও।

এই বিষয়ে শিক্ষকমহাশয় শ্রী অরুণ কুমার দেবনাথ বলেন, 'এই ধরণের কার্যক্রম শুরু করা অত্যন্ত প্রয়োজন কারন এর ফলে একাধারে ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত হবে আবার অন্যদিকে তারা স্কুলে আসতে উৎসাহ বোধ করবে'। এর সাথে সাথে স্কুলে শুরু হয়েছে নানা শিক্ষা-মূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

এখানেই থেমে থাকেনি এই উদ্যোগ, শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন চিন্তা শুরু করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যে, ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে নিয়ে স্কুলের পড়ে থাকা জায়গায় সব্জী বাগান করার । এর ফলে পড়াশুনার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষ ভাবে শিখবে কিভাবে গাছের যত্ন নিতে হয়, কিভাবে চারা থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়। আবার সেইসব উৎপন্ন সবজী ব্যবহার হবে স্কুলের মিড-ডে মিলে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের এই যৌথ উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকেনি শুধু এই একটা স্কুলে, অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসছে আরো নানা স্কুল।

শুধুমাত্র স্কুলের গন্ডীতেই আটকে থাকে নি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ, তারা এখন চিন্তা শুরু করেছে গ্রামে যে সব ১৪ – ২৫ বছর বয়স্ক স্কুলছুট যুবক যুবতী যারা কিছু করতে পারছে না, একেবারে পিছিয়ে পড়া, হতাশায় ভুগছে তাদের এক নতুন পথ দেখানোর। এমন-ই একজন যুবতী সাতালী মন্ডলপাড়ার মধুমিতা মিনজ। সপ্তম শ্রেণীর পর তার আর পড়াশুনা হয়ে ওঠে নি

. . . এর পর ৪ পাতায়

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সৃজনী প্রয়োগের নতুন পরিসর

বিশ্বায়নের বানিজ্য-স্বার্থকেন্দ্রিক উন্নয়ন-ভাবনার সাথে সঙ্গতি রেখেই যখন দেশের মানবসম্পদ এবং শিক্ষার ভবিষ্যত নির্ধারন করা হচ্ছে, যখন বানিজ্যায়ন এবং বেসরকারীকরনের জটিলতায় শিক্ষা কল্যাণমূলক উদ্যোগের বদলে পরিষেবাতে পর্যবসিত হয়েছে, যখন সারা দেশ জুড়ে নির্মম ঔদাসীন্যে বিভিন্ন শ্রেনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার স্বপক্ষে ওকালতি করছেন গণমাধ্যমের শিক্ষাবিদরা, তখন রাষ্ট্র-প্রসারিত অধিকার আইনের পেছনে যত সৎ এবং প্রগতিভাবনা প্রাণিত লক্ষ্য থাক না কেন, এর প্রয়োগ যেহেতু বিপুল আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সদিচ্ছা এবং কর্মকুশলতার ওপর নির্ভরশীল, তাই প্রতিমুহূর্তে অধিকারের ক্ষেত্র এবং পরিসর বিভিন্ন মাত্রার গণ উদ্যোগের মধ্যের দিয়ে বৃদ্ধি করতে না পারলে সমগ্র অধিকার ভাবনা শুধু কাগজ কলমেই পর্যবসিত হতে বাধ্য। আর সে জন্যই শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে পাশ হওয়ার পর থেকেই আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন জটিলতার সম্মুখীন এবং তার একটা বড় অংশই আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সামনে আসছে। 'নবদিশা'র যেহেতু রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার প্রসঙ্গে ভিন্নমত আছে

. . . এর পর ৩ পাতায়

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে শিক্ষা

বিশ্বায়নের সময়পর্বে বাজার বাহিত উন্নয়ন ভাবনায় রাষ্ট্র অনেকাংশে তার কল্যাণময় ভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজারের ভাবনার মৌলিক প্রতিস্থাপক হিসেবে যে ভাবে কাজ করছে তা একদিন রাষ্ট্রের উন্নয়ন ভাবনার ছকেও পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় এবং এই ঘটমান পরিবর্তনের মধ্যেও এমন অনেক সংলাপ থেকে যায়, যা বাজার এর ভূমিকার ওপরেও নিজের প্রতিস্থাপন বিন্দুগুলিকে অনবরত সমীকৃত করতে শুরু করে।

নবদিশা শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনার সুগভীর বহুমাত্রিকতার মধ্যে এমন অনেক প্রস্থান বিন্দু রয়েছে যা আমাদের বিগত কয়েক দশকে সারা ভারতে যে মূল ধারার উন্নয়নের ধারাপাত পঠিত হয়ে চলেছে তার বিপ্রতীপে নতুন ভাবনা সরনী সৃষ্টি করে এবং শুধুমাত্র স্থানীয় স্তরের জ্ঞান এবং সংস্কৃতিকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনা। বরঞ্চ জ্ঞানের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সে অন্তর্ভুক্ত করে

. . . এর পর ৩ পাতায়

উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্‌-এর চোখে ঊনবিংশ শতকের বাংলার শিক্ষাচিত্র

১৮১৮ সালে স্কটল্যান্ডবাসী উইলিয়াম অ্যাডামস্ (১৭৯৬-১৮৮১) ভারতে তথা কোলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে আসেন একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি হিসাবে। সেখানেই তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শেখেন। অ্যাডামস্ রোজগারের পথ হিসাবে সরকারি কাজে যোগ দেন। ১৮৩৫ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর সরকারের নির্দেশে বাংলা ও বিহারের কিছু অংশে শিক্ষা সমীক্ষা করেন। EDUCATION IN BENGAL AND BEHAR এই শিরোনামে তিনটি পর্যায়ে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রিপোর্টটি এক অবিস্মরণীয় দলিল। ১৮৩৮ সালে শেষ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বর্তমান নিবন্ধের সমস্ত তথ্য ৩য় রিপোর্টটি থেকে সংকলিত। আমাদের আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রাখব বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা, যথা - মুর্শিদাবাদ,বীরভূম ও বর্ধমান-এর মধ্যে। মনে রাখতে হবে জেলাগুলির সে সময়কার সব থানায় সমীক্ষার কাজ হয় নি। গত দুটি সংখ্যাতে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। উৎসাহী পাঠকদের নবদিশার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যদি চান আগের সংখ্যা দুটির জন্য নবদিশার দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন।

৩য় ও শেষ পর্ব বর্ধমানঃ

এই জেলার ১৩টি থানাতেই অ্যাডম্‌স্ সমীক্ষা করেন এবং ৯৩১টি স্কুলের সন্ধান পান। প্রতিটি থানাতেই বাংলা ও সংস্কৃত মাধ্যম স্কুল ছিল। জেলা জুড়ে বাংলা মাধ্যম স্কুল ছিল মোট ৬২৯টি এবং সংস্কৃত মাধ্যম স্কুল ছিল ১৯০টি। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির মধ্যে ৭টি পাওয়া গিয়েছিল একটি গ্রামে, ৬টি অন্য একটিতে এবং ৫টি তৃতীয় একটিতে। ৯টি গ্রামের সন্ধান মিলেছিল যেগুলির প্রতিটিতে ছিল ৩টি করে স্কুল, ৫৯টিতে ২টি করে এবং বাকীগুলিতে একটি করে। কয়েকটি গ্রামের স্কুলের সংখ্যাধিক্য শিক্ষার আগ্রহকেই তুলে ধরে।

. . . এর পর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

শিক্ষানীতি কি হওয়া দরকার

প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সমাজ যে জ্ঞান সমূহ অর্জন করেছে, একটা শব্দে তাকেই আমরা শিক্ষা বলি। প্রশ্ন হল আগামী প্রজন্মের কাছে সেই জ্ঞান সমূহ অর্থাৎ শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যায় কী ভাবে? শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যেহেতু শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম নয় তাই একটা নীতির প্রয়োজন হয় কাঠামোটাকে ধরে রাখার জন্য।

প্রাচীন শিক্ষানীতি কি ছিল সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক। টোল বা চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা নামে দুধরণের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সে গুলি সমাজের জ্ঞাণী মানুষরাই চালাতেন। সমাজই তাদের স্থান দিত, আর রাষ্ট্র সেখানে ছিল নিমিত্ত মাত্র । প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব বা ব্রহ্মত্ত অর্জন। এই শিক্ষানীতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল - ক) এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষা সমাজের সকল সদস্যের জন্যই বরাদ্দ ছিল, আর ঘরে ঘরে বা পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ ছিল সেই জ্ঞান বিতরনের সামাজিক জায়গা। খ) মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাই এই শিক্ষানীতির প্রধান বিষয় ছিল – মানুষের ধর্ম, সমাজের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই যাতে শিক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ সমাজ নির্ভর একটা শিক্ষানীতি ছিল।

কিন্তু ব্রিটিশরা এদেশে আগমনের ফলে ব্রিটিশ সভ্যতার ঝলকানিতে মুগ্ধ হয়ে এদেশের শিক্ষানীতি নির্নয়ক বিশেষজ্ঞরা প্রাচীন পূর্বপুরুষদের শিক্ষানীতি -টাকেই জলাঞ্জলি দিলেন। ওদিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বিরোধে সমাজ কোণঠাসা হতে লাগল। তার ফলে আমাদের টোল চতুষ্পাঠী ও পাঠশালাগুলি অনাহারে এবং অপুষ্টি রোগে ভুগতে ভুগতে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেল। প্রাচীন শিক্ষানীতিগুলির ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে ব্রিটিশ শিক্ষানীতি চালু হল। অন্ধের মতো আমরা অনুসরণ করতে লাগলাম। ফলে আমরা প্রাধান্য দিলাম মানুষকে টাকা রোজগারের যন্ত্র বানানোর শিক্ষাকে আর জলাঞ্জলি দিলাম মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাকে। সেই ইংরেজদের স্কুল-কলেজের অনুকরনেই আমাদের দেশের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তৈরি হল যার অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় সহায়তায়। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন "অতীতের সঙ্গে আত্মবিচ্ছেদেই ভারতীয় দুর্দশার প্রধান কারন"। ফলতঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠল "বিদ্যাকারখানা"। সন্তানকে পড়াবেন বিদ্যাকারখানায় আর আশা করবেন সে মানুষ হবে, তা সম্ভব নয়। সে বড়জোর অনেক টাকা রোজগারের যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আয়তনে যে পরিমানে বেড়েছে, তাদের ভিতর থেকে জ্ঞানরসের চর্চা বা প্রকৃত শিক্ষা সেই পরিমানে কি বেড়েছে? আসলে ছেলেমেয়ে জন্মালেই তাদের ধরে নিয়ে সেই বিদ্যাকারখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের যন্ত্র বানাতেই হবে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষাবিদরা খেয়াল করেন না, প্রাকৃতিক আলোর প্রধান উৎস যেমন সূর্যের আলো, জ্ঞানের আলোর প্রধান উৎস সেরকম স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জ্ঞান; যা প্রতিটি মানুষের ভিতরে, প্রত্যেক মানব শিশুর মনের গভীরে, মানুষের চারপাশের প্রকৃতিতে, প্রতিটি সত্তার ভিতরে এবং সত্তার সঙ্গে সত্তার সম্বন্ধের নিয়মে মানুষের ভিতরে পুঞ্জীভুত থাকে।

সূর্য ছাড়া শুধুমাত্র ইলেকট্রিক আলোর উপর নির্ভর করে যেমন মানুষের সমাজ বাঁচতে পারে না, তেমনি জগতের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জ্ঞানের আলোকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমাদের কথা হল সূর্যের আলোও চাই, বৈদ্যুতিক আলোও চাই। উভয়কেই তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। কারন মানুষের আবিষ্কৃত কোন জ্ঞানই ফেলে দেওয়া যায় না, তা সে আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, গাণিতিক বা মানসিক হোক । আর এই কথা মাথায় রেখে আমাদের শিক্ষানীতি তৈরি হওয়া দরকার।

তাই চলতি পাঠ্যক্রম যেটা আছে সেটার মধ্যে আঞ্চলিক কিছু বিষয় সংযোজন করা দরকার যেমন স্থানীয় সংস্কৃতি, ভুগোল, ইতিহাস বা জীবনযাপন পদ্ধতি, যা কেন্দ্রীয় ভাবে সম্ভব নয়। একমাত্র আমাদের পঞ্চায়েতগুলি সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করে যদি উদ্যোগ গ্রহন করে তবেই একটা বাস্তব সম্মত শিক্ষানীতি তৈরি হবে।

সুখের কথা এই যে ২০০৫ জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোয় উপরের ভাবনাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন হল তা কার্যকরী করবে কে? পাঠ্যক্রমে যে গুলি বলা হয়েছে সেগুলিকে প্রথমে শিক্ষক মহাশয়-দের বুঝতে হবে এবং আত্মস্থ করতে হবে। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন।

বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্রে একদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা, স্কুল পরিচালন কমিটি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, অবিভাবকমণ্ডলী এবং অন্যদিকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলিত ভাবনাই হয়ত আঞ্চলিক নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি স্কুলে এক নতুন রূপে অবতীর্ন হতে পারে ।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিক্ষা ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই এটা বলতে হয় যে তাদের দুজনেরই শিক্ষাভাবনা ছিল তাদের নিজস্ব একটা দর্শন যা আজও অনেকাংশেই প্রাসঙ্গিক। সময় বদলানোর সাথে সাথে শিক্ষা নিয়ে নানান আলোচনা এবং চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষা নিয়ে নানান মহলে গবেষণা চলতেই থাকে। ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতি এই গবেষণার জোয়ারে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম

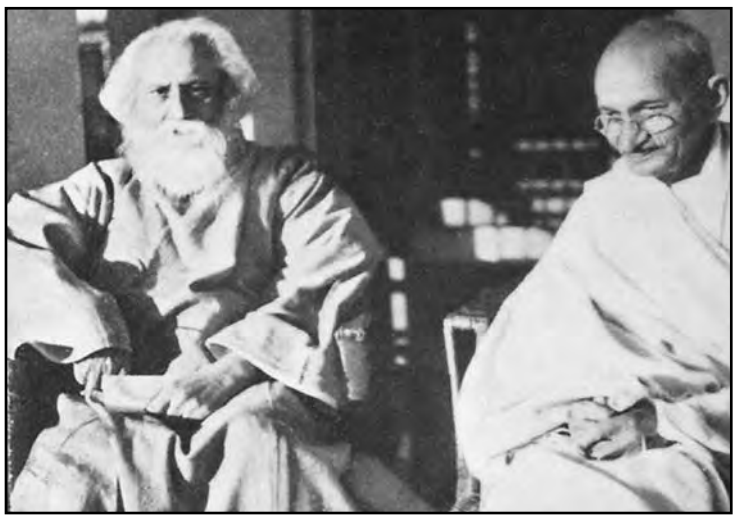

হল। নবদিশা সবসময় আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপর জোর দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করে থাকে। তাই নিচের লেখাটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-নাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা যা আজও প্রাসঙ্গিকতা দাবী করে,তা দেওয়া হল। আশা রইল লেখাটি তাদের কাজে লাগবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে যখন শিক্ষার সূচনা ঘটে তখন ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষা পরিব্যপ্ত। প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষাধারা মেকলে'র মডেলেই সুপ্র-তিষ্ঠিত। এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্য-বস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনার সূচনা। রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ১৮৭৭ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তসারশূন্যতা তাঁর কাছে প্রথমেই ধরা পড়ে। শৈশবেই তার মনে হয়েছিল এ শিক্ষা প্রাণহীন এবং যান্ত্রিক। তিনি একে "কলের শিক্ষা" আখ্যা দিয়েছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা তাঁর "শিক্ষার হেরফের" লেখাটিতে আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। তিনি বলেন-ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়। কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়—এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি,একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে। তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না—তাহা তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে—সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বাল-কদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র। এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে-বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপমা-ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা ভাবনাকে চারিত করে ছিলেন, তেমনি গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা ভাবনা ও শিক্ষা সাধনার উদ্যোগ নেন মূলতঃ সবরমতী বা সেবাগ্রামে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

গান্ধীজির আন্দোলনের ফলে দেশের কোনো কোনো স্থানে তাঁর সবরমতী সেবাগ্রামের আদর্শে কিছু আশ্রম গড়ে ওঠে এই সমস্ত স্থানেও গান্ধীজির শিক্ষা দর্শনের মডেলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। মূলতঃ মডেলটি ছিল "নঈ তালিম" বা বুনিয়াদি শিক্ষা যার কিছুটা রবীন্দ্রনা-থের শিক্ষার ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গান্ধীজির মতে ব্রিটিশ-দের তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হল "গোলাম তৈরির কারখানা"। তাঁর কথায় বলতে গেলে "আমরা কেবল-মাত্র ইংরাজদের শিক্ষা গ্রহণ করে জাতি ও দেশকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছি। অসততা এবং অত্যাচার বেড়েছে। ইংরাজী জানা ভারতীয়রা সাধারণ মানুষকে ঠকাতে বা ভয় দেখাতে ইতস্তত করে না"।

গান্ধীজির শিক্ষা ভাবনা ছিল নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা যা প্রতিটি শিশুর জন্য সাত বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। সাত বছরের এই শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপাদন মূলক শরীর শ্রমকে কেন্দ্র করে দেওয়া হবে। আর সেই শারীরক শ্রম হবে শিশুর আঞ্চলিক পরিবেশ নির্ভর অর্থাৎ কৃষি, বৃক্ষরোপণ ও পালন, পশুপালন , সুতোকাটা, কাপড় বোনা ও তার রং ছাপায়ের কাজ এবং গ্রামের উৎপন্ন শস্য ও ফল সজিকে আহারের উপযুক্ত করার কাজ, ধান ভাঙা, আটাপেষাই, কামার, কুমোর, ছুতোরের কাজ, কাগজ তৈরি, মৌমাছি পালন ইত্যাদি যে গুলি গ্রামের প্রচলিত বৃত্তিমুলক শিক্ষা মধ্যেই পড়ে।

মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা যদি সামাজিক মানুষ হিসেবে বিকশিত করার সুযোগ করে নিতে না শেখায় তা হলে তা হবে নিরর্থক।

■■

সমস্ত স্তরের শিক্ষাকে হতে হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ ..... শিক্ষা শুধুমাত্র একটি প্রজন্মকে তৈরি করে না বরঞ্চ সমাজের মৌলিক প্রত্যয়গুলিকে এবং ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে।

- গান্ধীজি

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে শিক্ষা এবং নবদিশার ভাবনার ঃ

..... প্রথম পাতার পর

দিতে চায় স্থানীয় জ্ঞানের মহান ঐশ্বর্য। আমরা এই নিবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করবো কি ভাবে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়পর্বে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী (thematic expert group) এর ভাবনার সাথে আমাদের ভাবনার বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক সাযুজ্য স্থাপিত হয়েছে। এই সাযুজ্যগুলি আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের অতি-সংক্ষিপ্ত প্রায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রভাব হিসাবে দেখছি না। আমরা একটু দেখে নিতে পারি এই প্রতিবেদনে নতুন কোন ধরনের দিকগুলি সামনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেখানে প্রধান প্রাসঙ্গিকতা গুলি কোন ধরনের।

প্রধানত ৫টা অধ্যায়ে বিভক্ত এই প্রতিবেদনে (Working group Report on Elementary Education and Literacy) খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে Curricular Renewal for quality অর্থাৎ পাঠক্রমের গুণগত মান নামে একটা অধ্যায় রয়েছে, যেখানে স্থানীয় ভাবে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং বৃহত্তর ঐতিহ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ শিক্ষার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং খুব অর্থবহ ভাবে এখানে জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা ২০০৫ এর কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতার সাথে নিয়ে আসা হয়েছে। শিশুর মূল্যায়নের Continuous comprehensive Evaluation (CCE) প্রসঙ্গ খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে আরো এসেছে পাঠ্যক্রম নবায়নের কথা যা নবদিশার ভাববিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে শিশুরা শুধুমাত্র নীরব গ্রহীতা হয়ে না থাকে তার জন্য তাদের ভালো গ্রন্থাগার এবং রসায়নাগারের সুবিধা প্রাপ্তির দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। এবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়ে দ্বিপ্রাহারিক আহার নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা শুনেছি এমনকি অমর্ত্য সেন, জ্যাঁ দ্রেজের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের আলোচনাতে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। এই প্রতিবেদনে সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশ খুব স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদন দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেছে প্রতিটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রসুই বাগান করাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং তার পাশাপাশি বলা হয়েছে ডিম এবং সবুজ সবজির মতোন পুষ্টিকর খাবার প্রতিদিন দিতে হবে কারন দেখা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত মিড-ডে মিল এর উদ্যোগে পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে জোর খুব কম পড়েছে। আমরা মনে করি এগুলি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রিয়াশীল পেশাদার সংস্থাগুলির আরো বেশী করে সামনে নিয়ে আসা খুব দরকার।

আমরা এই রেকমেণ্ডেশন (Recommendation)-এর কিছু অংশ তলিয়ে দেখতে পারি। এখানে বলা হয়েছে শিশু এবং তার অভিভাবকদের পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষিত করা খুব জরুরী যাতে তারা মিড-ডে মিলকে ঘরের খাবারের বিকল্প হিসাবে না দেখে পরিপূরক হিসাবে দেখে।

এখানে মিড-ডে মিলকে ঘিরে রাষ্ট্র নির্ভর উন্নয়ন ভাবনা গুলির যে অ্যাডভোকেসি অধিকার-ভিত্তিক উন্নয়ন ভাবনার নামে সারা দেশ জুড়ে চলে তার থেকে নীরব প্রস্থানের প্রতিসরণের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে পুষ্টি যোজনের পরিকল্পনায় পরিবারকে যুক্ত করা হয়েছে।

(Recommendation)-এ আরো সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে সবুজ পাতা সম্পন্ন সবজি মিড-ডে মিলে আরো বেশি করে যুক্ত করতে হবে এবং এই প্রজ্ঞানটিকে পড়তে হবে বিদ্যালয়ের অঙ্গনে পুষ্টি বাগান সৃষ্টি এবং পরিচর্যার নিরিখে। এমন কি স্কুল স্তরে এই পুষ্টি চেতনার সম্প্রসারণে জন্য বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী নির্দেশ দিয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক দপ্তর শিক্ষক, পাচক এবং তার সহকারীদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত করবে এবং শুধু তাই নয় আরো সুস্পষ্ট ভাবে এখানে বলা হয়েছে শিশুদের নিয়মিত ওজন এবং উচ্চতা পরিমাপ করতে হবে এবং পরিমাপের জন্য ও ওজন নেওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তা দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উপলব্ধ হতে হবে। অর্থাৎ এখানে রাষ্ট্র নির্ভর পুষ্টি ভাবনা থেকে প্রতিসরিত হয়ে তা যেমন পরিবারকে ভূমিসংলগ্ন বাহু হিসাবে প্রতিস্থাপিত করে এবং রাষ্ট্রকে নতুন দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তেমন ভাবে আমরা দেখেছি শিক্ষাপ্রনালীকে (Pedagogy) - কে নবায়িত ভাবনায় উপস্থাপিত কর নতুন বেশ কিছু ভাবনারও দিক নির্দেশ করে দিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা ২০০৫ এর গঠনমূলক শিখন প্রনালী শিশুকে শ্রেনী কক্ষের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন রকম ক্রিয়া কর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং প্রতিবেদন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছে শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে এবং বাইরে শিশুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুনর্ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের ভাবনার মৌলিক নির্যাস বিন্দুও এটাই। আমাদের ভাবনাতেও তাই প্রাসঙ্গিক ভাবেই রাষ্ট্র নির্ভর শিক্ষা ভাবনার বিপ্রতীপ নির্মানই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর এই সুবৃহত প্রতিবেদন রাষ্ট্রনির্ভর, রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক, রাষ্ট্রঅনুসারী প্রতিষ্ঠানের হাতে সমীকৃত শিক্ষার অঙ্গনে কতদূর প্রভাব ফেলতে পারবে তা বলা খুব জটিল। তবে যেসব রেকমেণ্ডেশন (Recommendation) তুলে ধরা হয়েছে, খুব নিশ্চিত ভাবেই তা আমাদের প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক বিদ্যালয় ও শিক্ষাভাবনায় শতজল ঝর্ণার ধ্বনি নিয়ে আসতে পারে। বিশেষত যেভাবে প্রতিপলে জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা ২০০৫ এর দর্শনগত প্রত্যয়গুলিকে সামনে আনা হয়েছে তা আমাদের মতে যদি বৈপ্লবিক নাও হয় শুভকামী পরিবর্তনের চিহ্নবহনকারী তো বটেই।

■■

বিশেষজ্ঞ কমিটির দৃষ্টিভঙ্গীতে মিড-ডে মিল ও পুষ্টি

দেশে সদ্য শুরু হওয়া দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ওয়ার্কিং গ্রুপ রিপোর্ট অন এলিমেন্টারী এডুকেশন নামক প্রতিবেদনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে উঠে এসেছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিশুদের পুষ্টির মানোন্নয়নের বিষয়টির ওপরে এবং সারা দেশময় যে মিড-ডে-মিল নামক মহাযজ্ঞ চলে তার সাথে এই পুষ্টি বিষয়টি যুক্ত করে পুরো বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে এবং সেজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে রসুই বাগান করাকে যেমন উৎসাহিত করা হয়েছে, তেমন ভাবেই সমগ্র মিড-ডে-মিল প্রক্রিয়ার সাথে যারা যুক্ত তাদের একটা পর্যায় পর্যন্ত পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতার বৃদ্ধির দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। বেশ কিছুটা সমালোচনার ভঙ্গীতে এই প্রতিবেদন এটাও বলেছে যে এতদিন পর্যন্ত মিড-ডে-মিল এর পুষ্টিগত আঙ্গিকটির ওপরে গুরুত্ব কম দেয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সৃজনী প্রয়োগের নতুন পরিসর ঃ

..... প্রথম পাতার পর

এবং জাতি-রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা যেহেতু সমস্ত কিছুকে রাষ্ট্রের মতো করে দেখতে বাধ্য করে, যেহেতু আমরা এই অধিকার প্রসঙ্গে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি, সেহেতু এর সীমাবদ্ধতার দিকগুলি নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্তরে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। ২০০৯ এর কেন্দ্রীয় আইন এর সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১২ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে যখন বিধি নিয়ম তৈরী হলো তখনও আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তার বিভিন্ন দিকগুলি আমাদের উদ্যোগের অঞ্চলগুলিতে বুঝিয়ে বলেছি। তবু এর মধ্যেই আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির আঙ্গিক এবং ত্রি-বার্ষিক বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপরে। নবদিশার মনে হয়েছে এই দুটি পরিসরে অনেক নতুন বিষয়ে সৃজনী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। এই প্রতিবেদনের সীমিত পরিসরে আমরা এর নির্মান এবং সংগঠনের দিকগুলি প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

West Bengal Right of children to Free and compelsory Education Rules 2012 অনুসারে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে ন্যুনতম ১২ জন থাকবেন। এখানে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি যে গ্রাম সংসদে অবস্থিত তার নির্বাচিত সদস্যের ওপরে। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে তার অন্তর্ভূক্তি এখানে আইনি বৈধতা পেয়েছে। এর পাশাপাশি কমিটিতে থাকবেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বিরাট সংখ্যায় অভিভাবকদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় যে ভয়াবহ দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটছে সে সম্পর্কে আইনে অনেক সাবধানতা রাখা আছে। ১০ জন সদস্য এই অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হবে। প্রথম শ্রেনীতে যাদের সন্তানরা পড়াশুনো করছেন এমন অভিভাবকদের মধ্য থেকে থাকবেন ২ জন যাদের একজন তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্যজন সাধারণ অভিভাবক নাগরিক। দ্বিতীয় শ্রেনীতে যাদের সন্তানরা পড়াশুনো করেছেন এমন অভিভাবক থাকবেন ২ জন, যাদের একজন তপশিলী জাতিভুক্ত এবং অন্যজন সাধারণ অভিভাবক নাগরিক। তৃতীয় শ্রেনীতে যাদের সন্তানরা পড়াশুনো করছেন তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন ৩ জন, যাদের মধ্যে ১ জন পিছিয়ে পড়া জনসম্প্রদায়ভুক্ত, ১ জন তপশিলী জাতিভুক্ত এবং অন্যজন সাধারণ অভিভাবক নাগরিক। যদি কোনো অঞ্চলে এইসব সম্প্রদায়ের অভিভাবক নাগরিকদের না পাওয়া যায় তবে সেই কোটা পূরণ করবেন সাধারণ অভিভাবকরা। চতুর্থ শ্রেনীতে যাদের সন্তানরা পড়ছেন এরকম অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন ৩ জন, যাদের ১ জন পিছিয়ে পড়া জন সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ২ জন সাধারণ বর্গের অভিভাবক নাগরিক। এছাড়াও এই বিধি নিয়ম আরো বলেছে ৫০% সদস্য হবেন মহিলা।

যা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির এই সব নতুন নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এবং পঞ্চম থেকে অষ্টমশ্রেনীর জন্য Rules for Management of Recognised Non-Government Instiutions (Aided and Unaided), 1969 আইনটিকেও প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান থেকে যিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের সদস্য তার নাম পাঠানোর জন্য জেলা বিদ্যালয় ইন্সপেক্টর নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে প্রধানকে চিঠি দেবেন এবং যদি তিনি নাম জানাতে ব্যর্থ হন তবে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এই কাজটি করবেন। এই বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির স্থায়ীত্ব হবে তিন বছর এবং এই পুরো প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে যদি কারো বিরোধিতা থাকে তাহলে Directorate School Education, West Bengal এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

এই বিধিনিয়মের ১৪ নং ধারায় আলোচনা করা হয়েছে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রসঙ্গে। নবদিশা তার উদ্যোগের এলাকাগুলোতে আইনের এই বিশেষ ক্ষেত্রটি প্রসঙ্গে সমাজের নানা স্তরে আলোচনা-সমালোচনার ওপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। নবদিশা উদ্যোগ মনে করে এক একটি বিদ্যালয়কে একক হিসাব ধরে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা না করা যায় তাহলে তথাকথিত সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুপ্রবিষ্ট করানো খুব কঠিন। এই বিশেষ ধারায় বলা হয়েছে যে প্রতিটি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির একটি করে ত্রি-বার্ষিক বিদ্যালয় পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বে তা জমা দিতে হবে। এই পরিকল্পনা জমা দিতে হবে District Inspector of School এর কাছে এবং পরিকল্পনাপত্র স্বাক্ষরিত হবে কমিটির সম্পাদক এবং সভাপতি দ্বারা। এই পরিকল্পনাতে যা থাকবে তা হলো –

প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের অবস্থান, ইতিহাস, পুরোনো ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সামগ্রীক ভাবে তাদের ভালো ভালো উদ্যোগ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিবছরে প্রতি শ্রেনীতে কত সংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভূক্তি সম্ভব এবং বিশেষ মনোযোগ দাবী করে এমন শিশু, বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে এমন শিশু তাদেরকে কতদূর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মৌলিক পাঠদান প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা সম্ভব সে প্রসঙ্গেও এই বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় আলোকপাত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ তিন বছরে বিদ্যালয়ের নতুন পরিকাঠামো কি দরকার হবে সে প্রসঙ্গেও একটা স্বচ্ছ বিবরন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

চতুর্থতঃ বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য নতুন কি ধরণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে তার আলোচনাও এই পরিকল্পনাতে রাখতে হবে।

পঞ্চমতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে যা আসতে পারে তা হলো সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে ঘিরে নতুন ধারার পরিকল্পনা এবং এখানে সরাসরি পাঠদান প্রক্রিয়ার বাইরের জিনিসগুলিও অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এখানেই নবদিশা মনে করে যে নতুন ভাবে গ্রামীণ শিক্ষাকে চিন্তা করার এবং তার প্রয়োগের একটা সুযোগ রয়েছে। নবদিশা যে স্থানীয় ভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ভাবনা সামনে নিয়ে আসছে, সরকারী বিদ্যালয় উন্নয়ন ভাবনার পরিসরে এই বিধি-নিয়মের সহজাত কঠোরতার মধ্যে থেকেও তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা মৌলিক পরিসর, এর মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত করা সম্ভব।

সামগ্রিক ভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অধিকার ভাবনার বিপ্রতীপে নবদিশা উদ্যোগের অবস্থান হলেও, নবদিশা নূন্যতম সুযোগগুলো হাতছাড়া করতে চায় না। শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে যে সব বন্ধু সংগঠন গুলি কাজ করছেন তাদেরকেও নবদিশা এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ভাবাতে চায়।

■■

কেন্দ্রীয় সরকারের ডাইস (DISE-District Information System for Education) ২০১১-১২ অনুসারে জেলাভিত্তিক স্কুলের তথ্যঃ-

	বিদ্যালয়	এনরোলমেন্ট ক্লাশ (১-৮)			এনরোলমেন্ট ক্লাশ (৯-১২)		শিক্ষক সংখ্যা				প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক		
		ছেলের সংখ্যা	মেয়ের সংখ্যা	মোট (১-৮)	ছেলের সংখ্যা	মেয়ের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা		মোট	ক্লাস ঘরের সংখ্যা	শিক্ষক পিছু ছাত্র সংখ্যা	ঘর পিছু ছাত্র সংখ্যা
বাকুঁড়া	৫,০৯৮	২,৯৮,০৯১	২,৮০,৮২০	৫,৭৮,৯১১	৮২,৪২৬	৬৪,৮৯২	১৭,৩৭৯	৭,২০৪	০	২৪,৫৮৩	১৫,৮৬৬	২৪	৩৬
বর্ধমান	৬,৭৪০	৫,৭২,৫৪৭	৫,৬৩,৩৪২	১১,৩৫,৮৮৯	১,৪৬,৯৫৬	১,৪৬,১৫১	২৫,১২০	১৬,৯৯১	৩১২	৪২,৪২৩	৩২,১৩০	২৭	৩৫
বীরভূম	৪,২৩৪	৩,০৫,৫৪১	২,৯৭,৬৭০	৬,০৩,২১১	৭২,০৮৮	৬৪,৫৪৫	১৫,১৯৯	৬,৭৭৮	০	২১,৯৭৭	১৪,২০৩	২৭	৪২
দক্ষিণ দিনাজপুর	২,২৬৯	১,৫৬,৪০৫	১,৫৩,৮৮৯	৩,১০,২৯৪	৩৯,৬৯৮	৩৯,০৭৭	৬,৭৬৭	৩,৬৪৭	৬	১০,৪২০	৮,১৬৫	৩০	৩৮
দার্জিলিং	১,৫২২	৫৬,৩২৮	৫৭,৪৮০	১,১৩,৮০৮	১৬,১৫৫	১৪,৬৭৩	৩,৭২০	২,৮৯৬	০	৬,৬১৬	৫,৫৭৮	১৭	২০
হাওড়া	৩,৭৮৯	৩,০৯,৪৮৮	৩,১৬,০৩৮	৬,২৫,৫২৬	৮২,০২৭	৯৩,৯৮৬	১১,৮২৭	১২,৪৭৬	১২৪	২৪,৪২৭	১৮,৫৬৯	২৬	৩৪
হুগলী	৪,৪০৩	৩,৫৭,৬১১	৩,৬৪,২৪৭	৭,২১,৮৫৮	৯৯,২৫৬	১,০৮,৭৩৮	১৬,৯৪০	১০,৬১৮	২২	২৭,৫৮০	২০,৬১১	২৬	৩৫
জলপাইগুড়ি	৪,৫৬৭	৩,৭৬,৯০৪	৩,৭৯,৭৬০	৭,৫৬,৬৬৪	৮৮,৫৪৭	৯৪,৪৮৪	১৩,০৮৬	১২,১১৫	০	২৫,২০১	১৬,২১৩	৩০	৪৭
কোচবিহার	৩,৬২২	২,৯০,১৪১	২,৮৭,৬৩৪	৫,৭৭,৭৭৫	৮২,০৭৬	৮৩,৬৪৩	১২,৪৩২	৬,৫৭৭	৮	১৯,০১৭	১২,২৭০	৩০	৪৭
কলকাতা	২,৭৪৩	২,০৬,২৭২	২,১৮,০০০	৪,২৪,২৭২	৮৮,৪৬১	৮৮,৩২৬	৯,২৩১	১৬,৩৯৮	০	২৫,৬২৯	২০,৫৭২	১৭	২১
মালদা	৩,৭৩৯	৩,৯০,৪৪৫	৪,২১,৩৩৮	৮,১১,৭৮৩	৭৭,৮৫০	৭৯,৫৩০	১৪,৭৬০	৮,২৫৭	১৪	২৩,০৩১	১৭,৩৪৩	৩৫	৪৭
মুর্শিদাবাদ	৬,৮৩০	৭,০৩,৪০৬	৭,৪২,৩৯৫	১৪,৪৫,৮০১	১,৩৮,২০৯	১,৫০,৭৭১	২৭,৯১০	১৫,০৫৮	০	৪২,৯৬৮	২৫,১৫৪	৩৪	৫৭
নদীয়া	৪,৪৭১	৪,০৩,৫০৯	৪,০১,৫৭৫	৮,০৫,০৮৪	১,২৩,২৯০	১,২২,০৬৯	১৭,১৯৪	১২,৫৯৩	৭	২৯,৭৯৪	২০,৫৩৭	২৭	৩৯
উত্তর ২৪ পরগণা	৭,০৩৯	৬,৭৪,৪৪০	৬,৯৪,২১৮	১৩,৬৮,৬৫৮	১,৯২,৫৯৩	১,৯৭,১০৪	২৪,৯৮২	২০,১৯৮	০	৪৫,১৮০	২৬,৬৮০	৩০	৫১
পশ্চিম মেদিনীপুর	৯,২৩৪	৫,১২,৬২২	৪,৯৪,৫৫০	১০,০৭,১৭২	১,৩১,২৯১	১,১৯,৮৩৭	২৮,৪২৭	১৭,২১৯	২০	৪৫,৬৬৬	২৯,৩১৬	২২	৩৪
পূর্ব মেদিনীপুর	৬,০৯১	৪,০৪,৫০৫	৪,০৩,৩৩৮	৮,০৭,৮৪৩	১,০৪,১৯৩	১,০৬,২৩৮	১৮,৪২৫	১৩,২৩৪	২	৩১,৬৬১	২২,৯৪২	২৬	৩৫
পুরুলিয়া	৪,৪৩৭	২,৭৮,৪৪০	২,৬৬,৯০৪	৫,৪৫,৩৪৪	৬৩,০৬৩	৪৭,২৭৫	১৩,৭১০	৪,৯৬৯	১৪৪	১৮,৮২৩	১৩,০২৬	২৯	৪২
শিলিগুড়ি	১,২৭৪	১,১৩,৭৮৩	১,১৪,১৯৩	২,২৭,৯৭৬	২৬,৮২০	২৫,৫০৫	৩,৭৭৫	৪,৪২১	০	৮,১৯৬	৬,০৩৭	২৮	৩৮
দক্ষিণ২৪ পরগণা	৬,৯১৭	৬,৫০,৪৮৭	৬,৭৪,০৭৯	১৩,২৪,৫৬৬	১,৪০,৬১৩	১,৪৬,৬৩৩	২১,৫৭১	১৮,৫৯৩	০	৪০,১৬৪	২৭,৮৮৯	৩৩	৪৭
উত্তর দিনাজপুর	৩,০৪৭	৩,০৮,৯০৫	৩,২৬,৬১৭	৬,৩৫,৫২২	৫৫,৩০৩	৫৬,৯৫২	৯,৪৮২	৬,৮৫৯	৬	১৬,৩৪৭	১১,০৫০	৩৯	৫৮
মোট	৯২,০৬৬	৭৩,৬৯,৮৭০	৭৪,৫৮,০৮৭	১৪৮,২৭,৯৫৭	১৮,৫০,৯১৫	১৮,৫০,৪২৯	৩,১১,৯৩৭	২,১৭,১০১	৬৬৫	৫,২৯,৭০৩	৩,৬৪,১৫১	২৮	৪১

কেন্দ্রীয় সরকারের জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি (DISE-Dustrict Information System for Education) উপরে দেওয়া হলো, যাতে দেখা যাচ্ছে প্রচুর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সত্ত্বেও এবং কাঠামোগত উন্নয়নের সরকারী প্রতিশ্রুতির পরেও অনেক জেলায় এখনও প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক পিছু ছাত্র সংখ্যা এবং ঘর পিছু ছাত্র সংখ্যা আশ্চর্যজনক ভাবে বিসদৃশ।

শিক্ষা কর্মশালায় নতুন উদ্দীপনা

গত ১৭ই আগাষ্ট কলকাতার অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র অ্যাকাডেমিক অফ ফাইন আর্টস্-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো নবদিশার এক দিনব্যাপী কর্মশালা যেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষা এবং পঞ্চায়েতিরাজ ভাবনা। এখানে প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত অংশীদারীবৃন্দ ছাড়াও ছিলেন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাতত্ত্ববিদবৃন্দ, যারা তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরে ছিলেন তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। নবদিশার পক্ষে শ্রী রত্নদীপ দে তার প্রারম্ভিক বক্তব্যে নবদিশার ভাবনাগুলি খুব দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেন এবং বলেন শুধুমাত্র শিক্ষার আইনী অধিকার আমাদের দেশে যথেষ্ট নয় এবং এখানেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ। এই অংশগ্রহণ যতবেশী তথাকথিত রাষ্ট্রীয় ভাবনার পরিসরে জায়গা করে নিতে পারবে ততবেশী করে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী দেবব্রত মজুমদার, শ্রী দেবাশিস মণ্ডল প্রমুখ । এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েতিরাজ এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশিষ্ট আধিকারিক শ্রী দিলীপ ঘোষ এবং সমাজবিজ্ঞানী শ্রী নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

তাদের আলোচনার মৌলিক সন্দর্ভগুলি যদি সূত্রবদ্ধ করা যায় তবে মৌলিক চুম্বকগুলি নিম্নলিখিতভাবে গ্রথিত হতে পারে।

প্রথমতঃ আধুনিক ভারতবর্ষে যে পাঠক্রম সারা দেশ জুড়ে বিদ্যালয় অঙ্গনে পাঠদানের জন্য ব্যবহার করা হয় তাতে স্থানীয় সংস্কৃতি এবং শিশু-কিশোরদের প্রতিদানের জীবনচর্চা এবং চর্যা কোনো ভাবেই প্রতিফলিত হয় না এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে আসে বিচ্ছিন্নতা যা গ্রামীন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্তশূন্য করে তোলে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা প্রতিনিয়ত যে বাস্তবতার সম্মুখীন তা পুঁজি নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অধিকার এর ধারনাও পুঁজির বিপ্রতীপে নতুন কোনো জগতসৃষ্টি করে না এবং তার জন্য প্রচুর মিডিয়া-নিনাদের মাধ্যমে আইনী অধিকারের সীমা সম্প্রসারণের কথা বলা হলেও তাতে নতুন কোনো পরিবর্তনের বার্তাচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ বিগত দু'বছরে পাঠ্য-পুস্তকের নির্মান এবং বিষয় ভাবনার কাঠামোতে অনেক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। এগুলি এখনো পর্যন্ত ইতিবাচক তবে এর মধ্যে নতুন আরো কি কি অনুপ্রবিষ্ট করানো যেতে পারে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থতঃ নতুন পাঠক্রম শুধু করলেই হবে না আমাদের যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং জরুরী তা হলো শিক্ষকদের মধ্যে নতুন চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করানো। এই চেতনাই তাদের আরো বেশি করে পাঠদান প্রক্রিয়ায় সৃজনী সম্ভাবনা নিয়ে আসতে অনুপ্রানিত এবং আলোড়িত করতে পারে।

পঞ্চমতঃ স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের সামাজিক পরিসর হিসেবে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবু এখনো পর্যন্ত আমরা শিক্ষার কিছু অনুষঙ্গ বহন ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকায় পঞ্চায়েতকে দেখিনি। তবে এবার সুনিবিড় অ্যাভোকেসীর মধ্য দিয়ে আমাদের স্থানীয় শিক্ষায় পঞ্চায়েতের ভূমিকাকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধুমাত্র কিছু পরিকাঠামো নয় বরঞ্চ পাঠক্রম পরিকল্পনা এবং গ্রামোন্নয়নের ভাবনার মধ্যে শিক্ষাকে নিয়ে আসতে পারলে খুব ভালো হয়।

এছাড়াও নবদিশার অন্যান্য পথিকরা তাদের ভাবনা তুলে ধরেন। তারা জানান প্রবল প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সুদূর বানারহাট থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত কিভাবে নবদিশার সম্প্রসারণ কাজ চলছে। তাদের সংলাপে একদিকে যেমন ছিল পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক শীতলতাকে পেরিয়ে যাওয়ার যন্ত্রনা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার ধূসর অভিজ্ঞতা, তেমন ছিল নতুন আশাপ্রদ দিকগুলি প্রসঙ্গে তাদের যুক্তিসঙ্গত আশাবাদ। সবমিলিয়ে এই কর্মশালা বিনিময়ে তর্কে - প্রতর্কে - বিতর্কে - সংলাপে মনোজ্ঞ এবং প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিল।

■■

..... প্রথম পাতার পর

নবদিশার পথে সাতালী গ্রাম পঞ্চায়েত

বিভিন্ন পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কারণে। কাকু, কাকিমা, পিসী আর ঠাকুমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করেই দিন কাটত তার। ভবিষ্যত নিয়ে কোনো স্বপ্নই তার আর চোখে আসত না। এমত অবস্থায় একরাশ স্বপ্ন নিয়ে তার পাশে এগিয়ে আসল গ্রাম পঞ্চায়েত। তাদের কাছ থেকে সে পেল গামার, মেহগনী, সুবাবুল প্রভৃতির বীজ। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় সে শিখল নার্সারী তৈরী। এই সম্বলকে পুঁজি করে মন প্রাণ দিয়ে সে গড়ল ৭০০ গাছের একটি ছোট্ট নার্সারী। কিছু বীজ নষ্ট হলেও কদিন পর দেখা দিল তার স্বপ্নের কুড়ি। বড় হতে লাগল চারাগাছগুলি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন লোকজন আসতে লাগল চারাগুলি কেনার জন্য। বিক্রি হতে শুরু হল চারা। ভবিষ্যতে আরো বড় নার্সারী করার জন্য চারা বিক্রি করে সে জমাতে শুরু করেছে পরের পুঁজি। মুখে এক অনাবিল হাসি আর মনে অপার আনন্দ নিয়ে চোখে তার এখন এক নতুন স্বপ্ন আর এই স্বপ্নকেই সাতালী গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিচ্ছে গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে এক নবদিশার পথে যাত্রা শুরু করতে।

নৌসান বেক

সাক্ষাৎকার

আরো উদ্ভাবনী মৌলিক পরিবর্তন জরুরী

শিক্ষাবিদ শ্রী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে একটি কথোপকথন

শিক্ষাবিদ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাথে নবদিশার সম্পর্ক সাম্প্রতিককালের। বিগত বহুবছর ধরে তিনি শিক্ষা জগতের সাথে নানাভাবে যুক্ত। নিজে শিক্ষক হিসাবে প্রচলিত শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদেই তার অন্য ধারার শিক্ষা উদ্যোগের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। পরবর্তীকালে নিজে শিক্ষকতা ছেড়ে শিক্ষা বিষয়ে নানা গবেষণামূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন আর সেই সূত্রেই তার সাথে আলাপ।

প্রথাগত সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মৌলিক সীমাবদ্ধতা। তাই তিনি বার বার তুলে ধরেছেন এই ব্যবস্থার পরিসীমায় অন্য শিক্ষার সম্ভাবনা যা সমগ্র ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার মতো মেধা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা বজায় রাখে।

নবদিশার ভাবনাচিন্তা সম্বন্ধে সন্দীপবাবুর মতামত জানতেই তার সঙ্গে আলাপচারিতার কিছু অংশ নিচে দেওয়া হল। সঙ্গে রইলো তার একটি বই-এর আলোচনা।

আমরা প্রথমেই প্রশ্ন রেখেছিলাম সন্দীপবাবুর কাছে আজ বিশেষত এই রাজ্যে আমরা অন্য ধারার শিক্ষা নিয়ে অনেক আলোচনা শুনেছি যেগুলি দু- দশক পূর্বেও প্রান্তিক ভাবনা হিসাবে ছিলো এবং এই যে মূল ধারা অভিমূখে তাদের যাত্রা হল একে তিনি কিভাবে দেখছেন? উত্তরে তিনি বলেন "আনন্দের বিষয় যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করছে। এর আগে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বর্তমানে আবার শিক্ষা আলোচনায় এসেছে এটাতো আনন্দেরই। তবে সামাজিক দাবী যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন শাসক শক্তি তাকে নিজের মতো করে আত্মস্থ করে নেয়। দাবীর ধারকে তারা এর ফলে মোলায়েম করে দেয়। যেমন মানবাধিকার আন্দোলনকেই বলা যেতে পারে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে এই অ-প্রথাগত শিক্ষা (non-formal education) নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং এ নিয়ে বই-ও বেরিয়েছে। তবে আসল কাজের জায়গায় এটা নিয়ে কাজ তেমন একটা হয় না। তবুও একে আমি ভাল তো বলবই কারন এই বইগুলিতে লেখার ধরন বদলেছে"।

শিক্ষায় আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গে সন্দীপবাবু বলেন, "আজ বুঝতে পারি যে এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। কারন পাঠ্যক্রম তৈরীর সময় আঞ্চলিক ভাগগুলো তো রয়েই গেছে। যদি কোন ফাঁকা জায়গা এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে রাখা যায় তাহলে সেখানে আঞ্চলিকতার উপর নির্ভর করে শিশুদের কৌতূহলের উত্তর দেওয়া যেতে পারে"।

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫(National Curriculum framework 2005) নিয়ে সন্দীপবাবুর প্রাথমিক বক্তব্য হল, "কাজটি অবশ্যই ভাল। এই অনুযায়ী কিছু কিছু বই তৈরী হয়েছে তাও বেশ ভাল। সমস্ত বই নিয়ে মন্তব্য করার দক্ষতা আমার নেই। তবে NCRT'র রাষ্ট্রের রূপরেখার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়,তাই পৌর ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে তারা যা বলেছেন তা খানিকটা আদর্শবাদী চিন্তাভাবনা অর্থাৎ বাস্তবে তা দেখা যায় না"। কিন্তু এতদসত্তেও শিক্ষা নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে তা নিয়ে তিনি আশাবাদী। কিছু সংগঠনের প্রভাব এর মধ্যে আছে। তিনি এও বলেন যে, "প্রথমবারেই যে ভাল জিনিষ হবে,তা আশা করা ঠিক নয়। তবে অনেকটাই নির্ভর করছে শিক্ষকরা এর ব্যবহার কিভাবে করবেন বা করছেন তার উপর, কারন সেটাও দেখার। কেননা একদিনে এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে ভাল লেগেছে নতুন সরকার কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষার বিষয়ে একটু জোর দিয়েছে। এছাড়া সারাদেশের জন্য একটা কাঠামো তৈরী হল এটা খুবই ভালো। যদিও এই উদ্যোগ প্রথম নয়। ইতিপূর্বে এই ধরনের কাজ হয়েছ, তাই এটি হয়ত আর একটি নথী হিসাবে সংযোজিত হল"।

অ-সরকারী সংগঠনগুলির উদ্যোগে যে কাজ হয়েছে তা নিয়ে সন্দীপবাবু একটু আশাহত কারন যা করা হবে বলে বলা হয় বাস্তবের সাথে তার অনেকটাই অমিল দেখা যায় এবং কার্যত তা পুরোনো পদ্ধতিতেই চলে। এই ব্যাপারে সরকারী সংগঠনগুলির সাথে অ-সরকারী সংগঠনের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

সন্দীপবাবু নিজে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা নিয়ে অনেকদিন কাজ করছেন তাই তাকে এপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে "রবীন্দ্রনাথের লেখার উদ্ধৃতি নিয়েই বেশীরভাগ মানুষ লেখে। শান্তিনিকেতন যেমন রবীন্দ্রনাথ একা করেননি তার সাথে অন্য অনেক শিক্ষকরা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন নিয়ে কাজ কেউই করতে পারেনি। তবে একথাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের পুরো ভাবনাই যে আজকে প্রাসঙ্গিক এমনটাও নয় কারন সময় অনেক এগিয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনে যত বেশী পরীক্ষা-নীরিক্ষার সুযোগ কমেছে, রবীন্দ্রনাথ নতুন নতুন পরিসর খুঁজে নিয়েছেন। প্রথম ১০-১২ বছর এই নীরিক্ষার পরিসর বজায় ছিল। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র/ছাত্রীদের যখন সরকারী শিলমোহরের প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন তা তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। এর পরই রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন তৈরী করেন। এর পিছনে মূল যে ভাবধারা কাজ করে, তা হল এখানে যারা পড়বে তারা গ্রামেই থাকবে এবং এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে তারা গ্রামেই কাজ করবে,তা সে যে পেশাই হোক। এদের মধ্যে থেকে আবার এমন কোন কর্মী তৈরী হতে পারে যারা ধীরে ধীরে সমাজকর্মী হয়ে উঠবে যাদের কারুরই সরকারী শিলমোহরের প্রয়োজন হবে না। তবে আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা নেই। শহরের মানুষ আমরা যদি ভাল থাকা খাওয়া চাইতে পারি তবে গ্রামের মানুষের চাওয়ায়তো কোন অন্যায় নেই। রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শ্রীনিকেতনের প্রভাব খুব ভাল ছিল না সাধারন মানুষের মধ্যে। কারন হিসাবে দেখা গেছে বাবা/মায়ের বাধা এবং একটু বেশী রোজগারের আশায় শহরে এসে কাজ করা। সবটারই কারন শ্রীনিকেতন থেকে শিক্ষালাভ করার পর তারা কোন সরকারী শিলমোহর পেত না, যা দিয়ে তারা আরও কোথাও কাজ করতে পারে"।

২০১০ সালে হওয়া শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে সন্দীপবাবুকে কিছু বলতে বলা হলে উনি বলেন, "আইন থাকা সবসময়ই ভাল। তবে এই আইন হওয়ার জন্য যারা আন্দোলন করেছিলেন তাদের আজকাল বড় একটা সামনে দেখা যায় না। অন্যদিকে আরও একটা বিষয় খুব সত্যি যে রাষ্ট্র বর্তমানে জনকল্যাণমূলক কাজে আর টাকা দিতে চায় না, আর তাই আইন হতেও ১৬ বছর সময় লাগল। তবে এই বিষয়ে আমি আগ্রহীও নই বা আশাবাদীও নই। আসলে আইন করে কিছু বন্ধ করা যায় না। আর একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, শিক্ষা তো সত্যিই অবৈতনিক নয়, কারন স্কুলের উন্নয়ন কল্পে যে টাকা দিতে হয় তার পরিমাণও কিছু কম নয়। এতদসত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে আইন থাকলেতো সবসময়ই জোর হয়"।

শিক্ষক সংগঠনগুলিকে পাঠ্যক্রম বা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কখনও সেভাবে সরব হতে দেখা যায় না এই ব্যাপারে নবদিশার পক্ষ থেকে ওনার মতামত জানতে চাইলে উনি বলেন, "আসলে ইতিপূর্বে শিক্ষকরা এত কম মাইনে পেতেন যে তাদের সবকিছুই এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বহুদিন তারা অত্যন্ত অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে ছিলেন এবং তাদেরকে এই বিষয়ে তৈরীও করা হয়নি। যদিও এটা কোন অজুহাত হতে পারে না। আসলে এই সমস্ত সংগঠনগুলো যদি রাজনীতির ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারত তাহলে তাদের কাছ থেকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা হলেও মতামত পাওয়া যেত"।

উক্ত আলোচনাটি নবদিশার পক্ষ থেকে বর্তমানে শিক্ষামূলক এবং প্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়াতে সেটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের উদ্দেশ্যে এই সংখ্যায় দেওয়া হল। পাঠকদের যদি এটি কোনভাবে কাজে লাগে আমাদের কাজটি সার্থক বলে মনে করব।

■■

অন্যশিক্ষার সন্ধানে

প্রকাশকের কথা উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে যে "প্রতিষ্ঠানের বাইরে শিক্ষাকে খোলা মাঠে নিয়ে আসার চেষ্ঠা দেখা যায় কেবল কিছু ব্যক্তি বা সংগঠনের বিক্ষিপ্ত প্রয়াসে। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অন্য শিক্ষার সন্ধানে" বইটি তত্ত্বের সাথে নিজের হাতে কলমে শিক্ষার এক বাস্তব সংকলন। ১৯৯৪ থেকে ২০০৩-৪ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছর ধরে বিভিন্ন গ্রাম শহর ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তার উপলব্ধির কথা বইটিতে ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্ব সবসময়েই কঠিন এবং নিরস হয়, কিন্তু সেই তত্ত্ব যখন অভিজ্ঞতার উদাহরণের সাথে বর্ণিত হয় তখন তা আর কঠিন বা নিরস থাকে না। সন্দীপবাবু নিজে সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় বইটিতে তার ভাষার উপর দক্ষতার প্রকাশ রয়েছে। আর ঠিক সেইজন্যই তত্ত্বও অত্যন্ত সরল ভাষায় এই বইটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা বিশ্বে নানা ধরনের কাজ অবিরাম হয়েই চলেছে,সন্দীপবাবুর এই বইটি সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে আর একটি সংখ্যা না বাড়িয়ে একটি কার্যকরী সংকলন।

নবদিশা'র পাঠক/পাঠিকা এবং যারা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত আছে বা শিক্ষা নিয়ে নতুন ভাবনা চিন্তা করতে চান, তাদের কাছে এই বইটির খবর পৌঁছে দেওয়ার কাজটি আমরা করলাম। একে ব্যবহার করে শিক্ষা জগতে সামান্য পরিবর্তন আনার গুরু দায়িত্বটা আমরা তাদের উপরই রাখলাম।

বই - অন্যশিক্ষার সন্ধানে

লেখক - শ্রী সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়
বিক্রয়কেন্দ্র -স্মরণিকা,
১৩এ, শিবদাস ভাদুড়ি স্ট্রীট,
কলিকাতা- ৭০০ ০০৪
মূল্য- ১৫০ টাকা

" শিশুর মধ্যে দেখা যায় ভাঙ্গার প্রবণতা। তারা যুক্তি দিয়ে কিছু বিচার করে না। অকারণে ভয় পায়, পালাতে চায়। সত্যিমিথ্যা যাচাই করে না।"

নাটকঃ এ কোন শিক্ষা?

(শিক্ষা বিষয়ক একটি ছোট নাটিকা)

[গান ও নাচ করতে করতে শিশুরা মঞ্চে প্রবেশ করে]

গান

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে

[মঞ্চের চারকোণে বেত নিয়ে শিক্ষকরা হিংস্র মুখে নাচতে থাকে।]

[নাচ থামলে হাফ সার্কেলে শিশুরা দাঁড়িয়ে যায় মঞ্চের অন্য প্রান্তে শিক্ষকরা।]

১ম জনঃ- আমরা শিশুরা পুতুলের মত।

২য় জনঃ- যাচ্ছি ভুলে হাসি খেলা দু'হাত তুলে দুরন্ত ছুট

৩য় জনঃ- বয়স্কদের লোভের চাপে প্রাণের উল্লাস আর মুক্ত জীবন

কোরাসঃ- কখন যেন যাচ্ছে হয়ে লুট

(শিশুরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, সূত্রধরের প্রবেশ।)

সূত্রধরঃ- আমাদের শিশুরা না নাচতে পারছে পারুলদিদির বনে, না মিলতে পারছে চাঁপা ভায়ের সাথে। আজকের বর্তমানে দাঁড়িয়ে ছাঁচে ঢালা শিক্ষা।

১ম জনঃ-আমরা বন্ধু নই কেউ কারো

২য় জনঃ- সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী, কেবল নিজের ভালো

৩য় জনঃ- বাকি সব বিচ্ছিরি

৪র্থ জনঃ- আমাদেরকে নিয়ে মানুষ গড়ার চলছে মহাফন্দি

সূত্রধরঃ- ওদের খেলতে দাও। নিজের খেলা যা কিছু নিজেরা খেলতে পারে। গ্রামের মাটি ওদের চিনতে দাও। ওদের দেখতে দাও গাছের সবুজ, ফুলের শোভা। একজনের সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দ-হুল্লোড় তুলতে দাও।

৫ম জনঃ- তাইতো আজ আমরা শিশুরা চিনছি না এমন কাউকে

৬ষ্ঠ জনঃ- যার ছবিটা আদর্শ বলে টাঙ্গানো দেওয়ালে।

৭ম জনঃ- সব মহাপুরুষের ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো

৮ম জনঃ- বইয়ের পাতায় বন্দি।

৯ম জনঃ- আদর্শ মানুষ আমাদের সামনে একটাও কেউ নেই

সবাই (ঘুরে চলে) নেই ..... একজনও কেউ নেই .....ছন্দে তালে চারিদিকে সব এলোমেলো।

সূত্রধর- শিক্ষার নামে আমরা একটা কল তৈরি করেছি যাহার নাম ইস্কুল। শুকনো সিলেবাস তৈরির মরা পদ্ধতিগুলো আমাদের আষ্টে-পিষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

তাইতো আমাদের শিশুরা কিছু না শিখে বছরের পর বছর উঠে যাবে উঁচু ক্লাসে।

১ম জনঃ- পরীক্ষা।

২য় জনঃ- ডিগ্রী

সবাইঃ- শেষে চাকরি।

৫ম জনঃ- উন্নতি হচ্ছে-হচ্ছে উন্নতি। বাড়ি, ঘর, কোথাও নেই কোনো খামতি। আচ্ছা আমাদের খবর কি কেউ রাখেন? আমরা যেন রবি ঠাকুরের অমল। [অমল দইওয়ালার নাটকের কিছু দৃশ্য] [লাঠি দিয়ে একটা জানালা করল অভিনেতারা তার ভেতর অমল সংলাপ বলে।]

অমলঃ- সেই যেখানে ডুমুর গাছেরতলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে তার পরে পুঁটলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগলো। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরনার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল।

পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব। আমি যা আছে, সব দেখবো -কেবলই দেখে বেড়াবো। পিসেমশাই আমাকে পন্ডিত হতে বলো না।

[মঞ্চের মাঝখানে আসে]

১ম জনঃ- তুমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হও

ছাত্ররাঃ- না।

২য় জনঃ- তুমি ডাক্তার হও

ছাত্ররাঃ- না।

৩য় জনঃ- তুমি অধ্যাপক হও

ছাত্রদের কোরাসঃ-তোমরা সবাই পণ্ডিত হতে বলছো, রোজগার করতে বলছো,

কিন্তু মানুষ হতে তো কেউ বলছো না!

গান

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে.....

[বৃষ্টি পড়ছে.....সাদা কাগজের টুকরো ওপর থেকে ফেলবে, মনে হবে যেন বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে নাচছে এবং ওদের নাচ দেখে মাষ্টার মশাইরাও বৃষ্টিতে ভিজছে নাচছে।]

একজন শিল্পী গান গাইছে ..... শিশুরা গলা মেলাচ্ছে। কেউ ছবি আঁকছে ..... কেউ গাছ বসাচ্ছে স্কুলের বাগানের জন্য .....।

(পুরো ব্যাপারটাই মাইমে হচ্ছে।)

আচ্ছা এরকম কি হতে পারে না?

..... প্রথম পাতার পর

উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্‌-এর চোখে ঊনবিংশ শতকের বাংলার শিক্ষাচিত্র

বাংলা স্কুলগুলিতে শিক্ষকের মোট সংখ্যা ছিল ৬৩৯। কোন কোন স্কুলে একাধিক শিক্ষক ছিল যাদের গড় বয়স ছিল ৪০ বছর। শিক্ষকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল মোট ২৭টি জাত ছিল। সর্বাধিক ছিল কায়স্থ, ৩৬৯ জন। এরপরেই ছিল ব্রাহ্মণ, ১০৭ জন। নিচুবর্গের শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এই জেলায় অ্যাডম্‌স্‌ চার জন শিক্ষকের সন্ধান পেয়েছিলেন যারা বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। এদের মধ্যে একজন মুসলমান এবং তিন জন হিন্দু ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে একজন ছিল চণ্ডাল। বাকী ৬৩৫ জন শিক্ষকের মোট মাহিনা ছিল ২০৭৬ টাকা। গড়ে প্রতি শিক্ষকের মাসিক মাহিনা ছিল তিন টাকার সামান্য বেশি। অন্য দু'টি জেলার মতই শিক্ষকরা শিক্ষকতা ছাড়াও সংসার প্রতিপালনের জন্য অন্য কাজ করতেন। যেখানে ব্যবসা থেকে পুরোহিতবৃত্তি সবই অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিছু স্কুল ছিল মিশনারিদের পরিচালিত যেগুলিতে শিক্ষকদের মাহিনা মিশনারিরাই দিত। আবার কিছু স্কুল ছিল যেগুলি শিক্ষকদের মাহিনা বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে আসত। কয়েকজন হিন্দু ছাত্রের খাওয়া খরচও বর্ধমানের মহারাজা চালাতেন।

সে সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অগ্রনী ভূমিকা অ্যাডম্‌সের দেওয়া একটি তথ্য থেকে বেশ স্পষ্ট। মিশনারিদের পরিচালিত একটি স্কুলে ছাত্রদের নদী পেরিয়ে আসতে হত। তাদের নদী পারাপারের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করেছিল।

এই জেলা অ্যাডম্‌সের মতানুযায়ী ছিল বীরভূমের মতই। একটি ক্ষেত্রে কেবল ব্যতিক্রম দেখেছেন অ্যাডম্‌স্‌। সেটি অভিভাবকদের অর্থনৈতিক সাহায্যে তৈরি হয়েছে।

৬২৯টি বাংলা মাধ্যম স্কুলে ছাত্র ছিল ১৩,১৯০ জন, অর্থাৎ গড়ে স্কুল-প্রতি প্রায় ২১ জন। তাদের গড় বয়স ছিল সমীক্ষার সময় প্রায় ১০ বছর। তাদের স্কুলে ভর্তির ও স্কুল ছাড়ার গড় বয়স যথাক্রমে আনুমানিক ৬ বছর ও ১৭ বছর। অর্থাৎ তারা প্রায় ১১ বছর কাটাত। ছাত্রদের মধ্যে ১৩ জন ছিল ক্রিশ্চান, ৭৬৯ জন মুসলমান ও ১২,৪০৮ জন হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল মোট ৫১টি জাতের ছাত্র ছিল। ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় ছিল সব থেকে বেশি, ৩,৪২৯ জন। এরপরেই ছিল কায়স্থরা, ১৮৪৬ জন। অন্য জেলা দুটির তুলনায় এই জেলায় ছাত্র সংখ্যা বেশি, উচ্চ ও নিচ উভয় বর্গের ক্ষেত্রেই। আর একটি বিষয়ও অ্যাডম্‌স্‌ লক্ষ্য করেছিলেন, মিশনারি স্কুলগুলিতে নিচুবর্গের ছাত্রসংখ্যার অনুপাত বেশি।

লেখার ক্ষেত্রে অ্যাডম্‌স্‌ যে বিবরণ দিয়েছেন তা আগের জেলাগুলির মতই। বিদ্যালয়ের যে বিবরণ দিয়েছেন তা আগের জেলাগুলির মতই। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে।

অ্যাডম্‌সের এই বিবরণী থেকে কয়েকটি বিষয় বেশ স্পষ্ট ভাবে জানা যায় –

১. অ্যাডম্‌স্‌ যে সময় সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন সেসময় শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সরকারি উদ্যোগ ছিল না। শিক্ষার উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল ছিল কোন রাজা, জমিদার, অভিভাবক, মিশনারি বা শিক্ষকের উপর।

২. স্কুলগৃহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল না, স্কুল বসত মন্দিরের চাতালে, জমিদারবাড়ির দাওয়ায়, গাছতলায়, এমনকি মুদিদোকানেও।

৩. ছাত্ররা নানা জাতের ছিল। তাদের মধ্যে জাত ভেদাভেদ খুব প্রকট ছিল না। শিক্ষকদের মধ্যেও নানা জাতের মানুষ ছিল। এক্ষেত্রেও জাত ভেদাভেদ খুব প্রকট ছিল না।

৪. শিক্ষকদের মাহিনা খুবই কম ছিল, তাই সংসার প্রতিপালনের জন্য তাদের অন্য কাজও করতে হত। অভিভাবক বা ধনী ব্যক্তিরা মাহিনার ব্যবস্থা করত। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্ররা পথে পথে গান গেয়ে মাহিনা ভিক্ষা করতো।

৫. সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য-পুস্তক ছিল না। শিক্ষকরা মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন।

■■

অ্যাডমের প্রথম প্রতিবেদনে

দেশীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় এই শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে সেই সব বিদ্যালয়গুলির কথাই বলা হয়েছে, যেখানে জ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়গুলিই শিশু-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংবাহিত হয়। শুধু তাই নয় এই সব বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি দেশীয় জনসমাজ দ্বারাই সৃষ্ট এবং সমর্থিত। এগুলি পুরোপুরি সমুদায় ভিত্তিক হবার জন্য যে বিদ্যালয়গুলি ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা সমর্থিত তার থেকে আলাদা বাংলায় এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি।

জনশিক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন যে, যদি দক্ষিণ প্রদেশের এই সব বিদ্যালয়গুলিতে মাসে ১ টাকা করে খরচ করা যায় তবে প্রতিবছরে ১২ লাখ টাকার তহবিল প্রয়োজন হবে, এর মধ্য দিয়ে বুঝতে পারা যায় শুধু বিহার এবং বাংলায় এই ধরনের ১০,০০০ হাজার বিদ্যালয় ছিলো এবং জনসংখ্যা যেখানে ৪ কোটি ধরে নেওয়া যায়, সেখানে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলা যেতে পারে প্রতি ৪০০ জন গ্রামবাসীর জন্য একটি করে বিদ্যালয় ছিলো।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা – ৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তি মূদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY